জাতীয়তাবাদের জট

মুস্তফা হুসাইন

ষোড়শ শতাব্দীতে রিফর্মেশনের মাধ্যমে শুরু হয় ইউরোপীয় খ্রিষ্টবাদের দুই ধারা, ক্যাথলিক ও প্রটেস্টেন্টদের মধ্যে দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের জের ধরে শুরু হয় ইউরোপের কুখ্যাত ধর্মযুদ্ধ। পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে একের পর এক যুদ্ধ। এর মধ্যে একটি যুদ্ধ ছিল "ত্রিশ বছরের যুদ্ধ" (১৬১৮-১৬৪৮)। বলা হয়ে থাকে ক্ষমতাসীন ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী প্রোটেস্টেন্টদের এই যুদ্ধে ৫০ লাখের বেশি মানুষ মারা গিয়েছিল। শেষমেষ ১৬৪৮ সালে দক্ষিণ জার্মানীর ওয়েস্টফিলিয়া নামক স্থানে শান্তিচুক্তির মাধ্যমে এ যুদ্ধের সমাপ্তি হয়। শান্তিচুক্তির এই ঘটনাটি পরবর্তীকালে দুনিয়ার ইতিহাসে এক রাজনৈতিক মাইলফলক হয়ে দাঁড়ায়। অনেক ইতিহাসবিদ এবং রাজনৈতিক গবেষকদের মধ্যে ওয়েস্টফিলিয়ার শান্তিচুক্তির মধ্য থেকেই জন্ম দেয় আধুনিক 'জাতিরাষ্ট্র' এর ধারণা।

দীর্ঘ যুদ্ধের মীমাংসার উদ্দেশ্যে ইউরোপের খ্রিষ্টান রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের সীমানা টানা হয়। তারপর, নতুন নাম দিয়ে ভাগ করে দেয়া হয় বিভিন্ন নগররাষ্ট্র। পরে বিশ্বব্যাপী ইউরোপীয় উপনিবেশবাদ কায়েম হওয়ায় সর্বত্রই এ চিন্তাধারা ব্যাপকতা লাভ করে এবং এটি পূর্ণতা পায় গত শতাব্দীতে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

খুব সহজে বললে, জাতিরাষ্ট্রের ধারণা অনেকটা এরকম –

শুরুতে নির্দিষ্ট সীমানা এঁকে দিয়ে ভূমির নামকরণ করে রাষ্ট্র ঘোষণা করা। তারপর সেই রাষ্ট্রের পরিচয়ে ঐ অধিবাসীদের চিহ্নিত করা! জাতির পরিচয় এখানে তৈরি হয় সীমানা-নির্ধারিত রাষ্ট্রের মাধ্যমে। মূল্যবোধ নির্ধারিত হয় রাষ্ট্রের আইনের ভিত্তিতে। ঐক্য, শত্রুতা-মিত্রতা, সুবিধা, অধিকার সবই হবে রাষ্ট্রীয় পরিচয়ে। অর্থাৎ, যার কোনো রাষ্ট্র নাই, তার কোনো পরিচয়ও নাই। ধর্মীয় পরিচয়, গোত্রীয় পরিচয় কোনো কিছুরই গুরুত্ব বা স্বীকৃতি নেই!

প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন: 'আধুনিক' জাতিরাষ্ট্রের ধারণা যদি এতই নতুন হয়, তবে এর আগে কী ছিল?

'জাতিরাষ্ট্র' এর পূর্বে প্রি-মডার্ন বা প্রাক-আধুনিক যুগে হাজার হাজার বছর শাসনকাঠামোগুলো (Government) পরিচিত ছিল সাম্রাজ্য (Empire), দেশ (Country), নগররাষ্ট্র, ইমারাহ, দাওলা (বংশীয় শাসন/dynasty), খিলাফাহ ইত্যাদি নামে। এসব শাসনকাঠামোয় মানুষের পরিচয়, ঐক্য, লেনদেনের কম্পাস হিসেবে কাজ করত দ্বীন, ধর্ম বা সুনির্দিষ্ট রাজ্যের রাজার আনুগত্য।

প্রাক-আধুনিক শাসন কাঠামোগুলো ছিল মানুষ নিজের বাসস্থান বা থাকার জায়গাকে আদর্শিক রূপদানের মতো ফিতরাতবিরোধী, বর্বর ও সাম্প্রদায়িক অন্ধত্বের মানসিকতা থেকে মুক্ত। কেবল অ্যামেরিকা বা বাংলাদেশে জন্ম নেয়ার কারণেই আমি হাইতি বা বতসোয়ানার মানুষের চেয়ে বেশি সম্মানের অধিকারী; এমন চিন্তা কেবল অসুস্থ মস্তিষ্কেই স্থান পেতে পারে। চরম গোত্রীয় জাতীয়তাবাদও এতটা অসার ছিল না।

আধুনিক সময়ের সীমানা এঁকে তৈরি হওয়া রাষ্ট্র এবং এর ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত শাসনব্যবস্থা হয়তো অনিবার্য ও সাময়িক বাস্তবতা হিসেবে মেনে নেয়া যেতে পারে।

কিন্তু জাহিলিয়াতের যুগের গোত্রীয় জাতীয়তাবাদের মতো রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদের ধারণাকে কোনোভাবেই মেনে নেয়া সম্ভব না। সীমানাবদ্ধ রাষ্ট্রের ভিত্তিতে একজন ব্যক্তি হয়তো ব্যবস্থাপনাগত ও দুনিয়াবি বিষয়ের সমাধান করতে পারে, নিজেদের মাঝে লেনদেনের কাঠামো ঠিক করতে পারে, নিজেকে উক্ত রাষ্ট্রের অধিবাসী হিসেবে বাংলাদেশী, লিবিয়ান পরিচয় দিতে পারে; কিন্তু, রাষ্ট্রের পরিচয় প্রধান পরিচয় ও মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করা, একে নিজ আদর্শের বিপরীতে বা ওপরে স্থান দেয়া নিতান্তই অমানবিক, এবং অবশ্যই তাওহীদ-বিরোধী আকীদা।

বাংলাদেশী পরিচয় কখনোই মুসলিম পরিচয়ের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে না, এর ওপর অগ্রাধিকার পেতে পারে না। একজন মুসলিমের কাছে ভারতীয় মুসলিমের চেয়ে বাংলাদেশী হিন্দু অধিক প্রিয়ভাজন হতে পারে না। নির্দিষ্ট বংশ বা বর্ণ পরিচয়ের কারণে শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করা যদি মানবতাবিরোধী হয়, তাহলে সুনির্দিষ্ট রাষ্ট্রে জন্ম নেয়াকে শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড বানানোও একই রকম

মানবতাবিরোধী হওয়ার কথা। কিন্তু, লিবারালিজমর বাতিল চিন্তাকাঠামোর অন্ধানুসারীরা এই বাস্তবতাকে চিনতে অক্ষম।

ইউরোপে খ্রিষ্টীয় শাসনের কঠিনতম পর্যায়েও, মানুষের নীতি-নৈতিকতাবোধ, সামাজিক মূল্যবোধ হাল জামানার 'আধুনিক জাতিরাষ্ট্র'-এর অধিবাসীদের চেয়ে উন্নত ছিল। এই অন্ধ জাতীয়তাবাদের চেয়েও বিকৃত খ্রিষ্টবাদ ছিল বহুগুণ মানবিক। ইসলামি শাসনের সাথে 'আধুনিক' অসভ্য 'জাতিরাষ্ট্রের তুলনা করার ফলে ইসলামের অবমাননা হতে পারে, সে আলোচনায় গেলাম না।

তবে, ওয়েস্টফিলিয়ার চুক্তির সময় স্বায়ত্তশাসন পাওয়া নতুন রাষ্ট্রগুলো থেকে 'জাতিরাষ্ট্র' ধারণার সাধারণ একটি কাঠামো পাওয়া গেলেও, তা আজকের জাতিরাষ্ট্রগুলোর মতো ছিল না। তাছাড়া এই রাষ্ট্রগুলো ছিল রাজতান্ত্রিক ধর্মতান্ত্রিক (theocratic) রাষ্ট্র। বিপরীতে খুব অল্প সংখ্যক কিছু রাষ্ট্রের রাজতান্ত্রিক শাসন আছে। অধিকাংশ (সর্বশেষ হিসাব মোতাবেক ১৫৯টি) রাষ্ট্রই আজ রিপাবলিক বা "প্রজাতন্ত্র" হিসেবে চিহ্নিত।

উল্লেখ্য, প্রজাতন্ত্র বা রিপাবলিক হচ্ছে এমন একটি শাসনব্যবস্থা যেখানে রাষ্ট্রক্ষমতা, শাসন ও আইনের মূল উৎস ধরা হয় রাষ্ট্রের জনগণের সমর্থনকে। এই সমর্থন সাধারণত গণতন্ত্র বা জনসমর্থিত স্বৈরশাসনের মাধ্যমে অর্জিত হয়। প্রজাতন্ত্রের বিপরীত ধরা হয় রাজতন্ত্রকে; যেখানে রাষ্ট্রক্ষমতা, শাসন ও আইনের মূল উৎস ধরা হয় ইসলামি শারীআ কিংবা অন্য কোনো ধর্ম, ঐতিহ্য বা খোদ রাজাকে। যা সাধারণত ইসলাম বা ধর্মীয় নীতির আনুগত্য কিংবা ভূতপূর্ব রাজার অনুমোদনের মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে। কাজেই, ইসলামি প্রজাতন্ত্রের স্বপ্নে যারা বিভোর তাদের একটু পুনর্চিন্তা প্রয়োজন সম্ভবত।

মূলত, লিবারেলদের কাছে পশ্চিমা দর্শন/ধর্ম লিবারেলিজমের অন্যতম ভিত্তি 'জাতিরাষ্ট্র' বা 'জাতীয়তাবাদ' (Nationalism)-এর আদর্শিক উদাহারণ হলো ফরাসি প্রজাতন্ত্র। যার প্রতিষ্ঠা ১৭৯২ সালে, কুখ্যাত ফরাসি বিপ্লব এবং সন্ত্রাসের রাজত্বের মাধ্যমে। গিলোটিন, খণ্ডিত মস্তক আর কানায় কানায় পূর্ণ বাস্তিলের কারাগারের বদৌলতে।

অতঃপর আসলো নেপোলিয়নের মহাদেশীয় যুদ্ধ। অবিশ্বাস্য সামরিক উত্থানের ফলে গোটা ইউরোপে ফরাসি বিপ্লবের আদর্শ ছড়িয়ে পড়তে লাগল কল্পনার চেয়েও দ্রুত গতিতে। ভেনিস, জেনোয়া, ডাচ... রাজতন্ত্র উচ্ছেদ হলো, কায়েম হলো রিপাবলিক!

আরো ভালো করে বললে রিপাবলিকান জাতিরাষ্ট্র। যে সকল রাষ্ট্র কেবল জাগতিক বুদ্ধির আলোকে হবে পরিচালিত। প্রাচীন আইন, সংস্কৃতি যতই কল্যাণকর হোক না কেন, 'আধুনিক' না হওয়ার 'অপরাধে' তাদের অবস্থান হবে আস্তাকুঁড়ে।

বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে, বিশেষত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর "রিপাবলিকান জাতিরাষ্ট্র" ধারণা দুনিয়াব্যাপী ব্যাপকতা লাভ করে। এছাড়া, ইউরোপীয় শক্তিগুলো নিজ ভূমিতে ফিরে যাবার আগে এশিয়া ও আফ্রিকায় উপনিবেশিক রাজতান্ত্রিক সাম্রাজ্যগুলোকে "রিপাবলিকান নেশন স্টেট" বা "প্রজাতান্ত্রিক জাতিরাষ্ট্র" তে রূপান্তরিত করে আসে।

অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী শক্তি (বিশেষত, অ্যামেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়ন) জাতিসংঘের মাধ্যমে গোটা দুনিয়াকে নিজেদের করায়ত্ত করতে মনোযোগী হয়। ফলে, প্রজাতন্ত্রগুলো তো বটেই, অল্প যে কয়টি রাজতান্ত্রিক শাসন বাকি থাকে, তারাও জাতিরাষ্ট্র কাঠামোকে গ্রহণ করে নেয়।

বিশ্বব্যাপী জাতীয়তাবাদের এই নতুন ধর্মের সুরক্ষা ও প্রসারে নিহত হয়েছে শত কোটির ওপর মানুষ। সংঘটিত হয়েছে দুটি বিশ্বযুদ্ধ, চল্লিশ বছর ধরে চলেছে শীতল যুদ্ধ। পারমাণবিক বোমায় একদিনে নিহত হয়েছে কয়েক লক্ষাধিক মানুষ। অব্যবহিত সময় পরপর হয়েছে, হচ্ছে গণহত্যা। আর রাষ্ট্রদ্রোহিতার নামে অবিকল খ্রিষ্টীয় ইনকুইজিশনের আদলে হত্যা, বন্দী আর নির্বাসনের শিকার হয়েছে, হচ্ছে কত শত কোটি মানুষ, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। নেই কোনো পরিসংখ্যান। 'আধুনিকতা'র ফেরিওয়ালারা দিনরাত ধর্মীয় সহিংসতার সমালোচনায় জীবন-যৌবন বিলিয়ে দেয়। অথচ, লিবারালিজমর উপহার নব্য জাহিলিয়াত "উগ্র জাতীয়তাবাদ"-এর ফলে সৃষ্ট কয়েক সহস্রগুণ সহিংসতা ও মানবিক বিপর্যয় দেখেও তারা ইচ্ছা-অন্ধত্বের পথ বেছে নেয়। আল্লাহ তাআলা এসকল জাহিলে মুরাক্কাব, আদর্শিক জারজদের ধ্বংস করুন।

১৯৭১ সালে পতাকায় পূর্ব বাংলার মানচিত্রের উপস্থিতি আর রেহমান সোবহানের নামকরণ; অস্তিত্বে আসার আগেই ঘোষণা করে দিয়েছিল "বাংলাদেশ" নামক জাতিরাষ্ট্রের। বাকি দুনিয়ার অনুকরণে আমাদের এই ভূমিতেও পূর্ণতা লাভ করে 'জাতিরাষ্ট্র' বা 'আধুনিক' জাতীয়তাবাদ নামক নয়া রাজনৈতিক দর্শন; যা সুস্পষ্টই তাওহীদের আকীদার সাথে সাংঘর্ষিক।

গোত্রীয় বা বর্ণবাদী জাতীয়তাবাদী প্রথায় সুনির্দিষ্ট কোনো গোত্র বা বর্ণের অনুসারী হওয়াকেই অন্যের ওপর শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড ধরা হতো। গোত্রের অনুসারী যাই হোক না কেন। আধুনিক জাতীয়তাবাদে গোত্রের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে রাষ্ট্র। এখন, বংশ বা বর্ণের পরিবর্তে জন্মভূমির মাধ্যমে অর্জন হয় শ্রেষ্ঠত্ব; যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে কোনো যোগ্যতা লাগে না।

ইসলাম তো বটেই, স্বাভাবিক মূল্যবোধের দাবিও এটাই যে, রাষ্ট্র কখনো ভালোবাসা-শত্রুতা, ন্যায়-অন্যায় নির্ধারণের মানদণ্ড হতে

পারে না। নির্দিষ্ট কোনো ভূখণ্ডে জন্ম নেয়ার ফলেই একজন মানুষ অন্যের চাইতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উন্নত হয়ে যায় না। বিশেষ করে জন্মের ওপর মানুষের যেখানে কোন নিয়ন্ত্রণই নেই। বরং, উত্তম-অনুত্তম কেবল ইসলামের বিচারেই নির্ধারিত হতে পারে। কেননা, এ উৎকর্ষ অর্জনের সুযোগ প্রত্যেক রাষ্ট্রের অধিবাসীর জন্যই উন্মুক্ত!
আল্লাহ তাআলা বলেন,

هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُمْ مُّؤْمِنٌ

"তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ হয় কাফির এবং কেউ হয় মুমিন।"

(২)

এদেশের ইতিহাসে পটপরিবর্তনকারী সবচেয়ে বড় ঘটনা হিসেবে দেখা হয় আওয়ামী লীগের নের্তৃত্বে পরিচালিত, বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে সংঘটিত ১৯৭১-এর যুদ্ধকে। পাকিস্তানের সেনাশাসিত সরকারের জুলুম ও আর্থ-রাজনৈতিক বৈষম্যের জের ধরে শেখ মুজিব ও তার সঙ্গীসাথিদের প্রচার-প্রোপাগান্ডায় পূর্ব বাংলায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তীব্রতা লাভ করে।
শেখ মুজিবুর রহমান একাধারে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের কথা কমবেশি বললেও, প্রকৃত অর্থে তিনি ছিল একজন জাতীয়তাবাদী নেতা। এর প্রমাণ পাওয়া যায়, তার অনুসারীদের মাঝে একদিকে খন্দকার মুশতাক, শেখ মনির মতো বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আবার অন্য দিকে তাজউদ্দিন, সিরাজুল আলম খানের মতো আল্ট্রা-বামপন্থীদের সন্নিবেশ থেকে। এক্ষেত্রে তার আদর্শ ছিল উপনিবেশবিরোধী সেক্যুলার জাতীয়তাবাদী নেতারা (যেমন- কেনিয়ার জোমো কেনিয়াত্তা, আলজেরিয়ার আহমেদ বেনবেল্লা, ইন্দোনেশিয়ার আহমদ সুকর্ন বা তিউনিশিয়ার হাবিব বুরগিবা প্রমুখ) ।
লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, বাঙালি জাতীয়তাবাদ আবার শুধু বাঙালি ভাষাকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদ নয়, বরং র‍্যাডক্লিফ লাইনের পূর্ব পাশে থাকা পাকিস্তান অংশের ভূমিকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদ। তথা জাতিরাষ্ট্র ধারণার আলোকে প্রস্তাবিত জাতীয়তাবাদ। অন্যথায় পার্বত্য চট্টগ্রামের অবাঙালিরা কেন পূর্ব বাংলার অন্তর্ভুক্ত হলো? আর কেনই-বা তারা পরে স্বাধীনতা চাওয়ার কারণে দমনের শিকার হলো? কেননা, রাজনৈতিক নিরাপত্তার চেয়ে রাষ্ট্রের অখণ্ডতা ও আকার অক্ষুণ্ন রাখা বেশি জরুরি।
বাংলাদেশের রাজনীতির চিন্তাধারার কেন্দ্রে রয়েছে, জাতিসংঘ নিয়ন্ত্রিত নব্য বিশ্বব্যবস্থার আলোকে সীমানা ও ভূমির আলোকে নির্ধারিত ভূমিকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদ। শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগের মানহাজ ছিল, পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবাদী উন্মেষকে কাজে লাগিয়ে পূর্ব বাংলা শাসন করা। শেখ মুজিবর রহমানের আন্দোলন ও রাজনীতির মূল লাইন ছিল 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ'। অর্থাৎ, পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালি পরিচয়কে বিশেষায়িত করা। আর ২৫শে মার্চ রাতে শুধুমাত্র বাঙালি পরিচয়ের কারণে পাকিস্তানী জান্তার ব্যাপক হাতে গণহত্যার শিকার হবার ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্ফুলিঙ্গ পূর্ব বাংলায় বিস্ফোরণে পরিণত হয়!
এ কারণেই শেখ মুজিবকে ১৯৬৬ সালে প্রথমে ফেডারেল সরকারের অধীনে অধিকতর স্বায়ত্তশাসন চাইতে দেখা যায়। অতঃপর ১৯৭০ এ কনফেডারেশন চাইতে দেখা যায়। এবং সবশেষে দেখা যায় আলাদা রাষ্ট্রের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে। বিষয়টা এমন না যে, শেখ মুজিব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চাননি। আবার এমনও না যে, তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা চাননি। বরং পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী তিনি উদ্দেশ্য পরিবর্তন করেছেন।

বাস্তবতা হচ্ছে, তোষামোদকারী ও শত্রুভাবাপন্ন, দু ধরনের ইতিহাসবিদের পক্ষপাতদুষ্ট আলোচনা এক্ষেত্রে আমাদের প্রান্তিক উপলব্ধির দিকে নিয়ে গিয়েছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনা পূর্ব বাংলার মানুষের অন্তরে প্রবেশ করাতে শেখ মুজিব ও তার অনুসারীরা শুরু থেকেই, পাকিস্তানকে নব্য উপনিবেশবাদ বলে আখ্যায়িত করত। মূলত অর্থনৈতিক শোষণ বা বঞ্চনার স্লোগান ছিল কেবল সাধারণ জনগণের আবেগের স্ফুরণ ঘটানোর উদ্দেশ্যে।
পূর্ব বাংলাকে আলাদা জাতিরাষ্ট্র করার লক্ষ্যে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ তাদের আন্দোলনের মূল নিয়ামক হিসেবে সামনে রাখে অর্থনৈতিক শোষণকে। শেখ মুজিবের মূল লক্ষ্য ছিল বাংলাভাষী জনতাকে উত্তেজিত করে রাষ্ট্রের প্রধান হওয়া। আর যেহেতু সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের সাহায্য ছাড়া নতুন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব দান কিংবা স্থায়ীত্ব অর্জন সম্ভব না, তাই সেক্যুলারিজম ও সমাজতন্ত্রের দিকে ঝোঁকা ছাড়া তার হাতে অন্য কোনো বিকল্প ছিল না।
অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র ফুটিয়ে তুলতে প্রচার করা "সোনার বাংলা শ্মশান কেন?" শীর্ষক স্লোগান ও পোস্টার গোটা পূর্ব বাংলায়

চরম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। নুরুল ইসলাম ও হাশেম খানের প্রচেষ্টায় চিত্রিত এই পোস্টারে তুলে ধরা হয় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতার তুলনামূলক চিত্র।

'৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ল্যান্ডস্লাইড বিজয়ের অন্যতম কারণ ধরা হয় এই পোস্টারটিকে। কিন্তু বাস্তবে পাকিস্তানবিরোধী আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক বৈষম্য নিরসন ছিল না, উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব বাংলায় একচ্ছত্র আওয়ামী নের্তৃত্ব কায়েম। তা কনফেডারেশনের আদলেই আসুক, আর আলাদা রাষ্ট্রের আকারেই আসুক।

অর্থনৈতিক উন্নতি নিশ্চিত করা যে প্রকৃত অর্থে আলাদা রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ছিল না, তার প্রমাণ মেলে ‘৭১ পরবর্তী বাস্তবতা ও পরিসংখ্যানে। বাঙালি অধ্যুষিত পূর্ব বাংলা আলাদা হয়ে বাংলাদেশে পরিণত হয় ১৯৭১ এর শেষদিকে। ১৯৭২ এর জানুয়ারিতেই বাংলাদেশে আওয়ামী শাসন কায়েমের পর, মুজিব সরকার যুদ্ধপরবর্তী পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার জন্য শুধুমাত্র বৈদেশিক সাহায্যই পায় তৎকালীন সময়ের আড়াই হাজার কোটি মার্কিন ডলার!

তথাপি, ‘৭১ এর পর থেকেই নিত্য ব্যবহার্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিল্প-কারখানা ও কৃষি ক্ষেত্রের উৎপাদন স্বাধীনতার পূর্বেকার (১৯৬৯-৭০) পর্যায়ে উত্তরণ করা সম্ভব হয়নি। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিডিপি) ১৯৭২-৭৩ সালে এসে ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের শেষ স্বাভাবিক বছরের (১৯৬৯-৭০) তুলনায় প্রকৃত অর্থে ১২-১৪% ভাগ কমে যায়। অনুরূপভাবে, মাথাপিছু জিডিপি ১৯৭২-৭৩ সালে ১৯৬৯-৭০ সালের চেয়ে একপঞ্চমাংশ কম ছিল।

দেশের মানুষের প্রধান খাদ্য ধানের উৎপাদন ১৯৭২-৭৩ সালে ১৯৬৯-৭০ সালের তুলনায় ১৫% ভাগ কম ছিল। ১৯৬৯-৭০ সালের তুলনায় শিল্প উৎপাদন ১৯৭২-৭৩ সালে প্রায় ৩০% ভাগ হ্রাস পায়। ১৯৬৯-৭০ সালের সামগ্রিক শিল্প-উৎপাদনের নিরিখে ১৯৭২-৭৩ সালে অবনতিশীল পরিস্থিতিতে শেখদেখা যায়। পাট শিল্পে উৎপাদন শতকরা ২৮ ভাগ, বস্ত্র শিল্পের ক্ষেত্রে সূতা উৎপাদন ২৩% ভাগ ও কাপড়ে ৩% ভাগ কম ছিল। এবং চিনি উৎপাদন হয়েছিল মাত্র পঞ্চমাংশ। ১৯৭২-৭৩ সালে দেশের রপ্তানি ১৯৬৯-৭০ সালের তুলনায় প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ কমে গিয়েছিল।

১৯৭৩-৭৪ সালের বার্ষিক পরিকল্পনা প্রতিবেদনে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন স্বীকার করে যে:

“দেশের কঠিন অর্থনৈতিক পরিস্থিতি জনগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত করছে। বিশেষভাবে ভূমিহীন গ্রামীণ শ্রমজীবী এবং ব্যাপকভাবে শহুরে জনগণ এই পরিস্থিতির শিকার। নিত্য-ব্যবহার্য মৌলিক সামগ্রীর অপর্যাপ্ততা ও উচ্চমূল্য সামগ্রিক সামাজিক ও রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়ে দিয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনার উদ্দেশ্য আওয়ামী লীগের সমালোচনা বা পাকিস্তানের প্রশংসা নয়। বরং, এবিষয়টির বাস্তবতা উপলব্ধি করা যে, স্রেফ পাকিস্তানীদের দ্বারা হত্যা-নির্যাতন, গণতন্ত্র বা বাক্স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপের ফলে ১৯৭১ এর বিপ্লব সংঘটিত ও সফল হয়নি। বরং এগুলো ছিল কিছু প্রভাবক যেগুলো শেখ মুজিবের মূল রাজনৈতিক লক্ষ্য তথা 'জাতিয়তাবাদী মুক্তি আন্দোলন'কে শক্তিশালী করেছিল।

'৬০ এর দশকের ছাত্র আন্দোলন এবং '৭১ এর গণযুদ্ধের ফলাফল হিসেবে তীব্র জাতীয়তাবাদী আবেগ জনমানসে জায়গা করে নেয়। যার ফলে পরবর্তীতে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোও বাঙালি বা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে আঁকড়ে ধরেই কর্মসূচি ও রাজনৈতিক বয়ান দাঁড় করায়। আর এক্ষেত্রে অগ্রগামী ভূমিকা রাখে জিয়াউর রহমান ও তার দল বিএনপি। বিনপি, “বাঙালি জাতীয়তাবাদ” এর পরিবর্তে “বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ” এর প্রবর্তন করে পরিভাষাগত জটিলতা দূর করার চেষ্টা করে।

ফলে নিষ্ঠুর বাস্তবতা হলো, যা ঘটার ছিল না তা ঘটে গেছে। যা হওয়ার না তা হয়ে গেছে। তীব্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জঠর থেকে জন্ম নেয়া এবং দীর্ঘদিন যাবৎ পরিচর্যা হওয়ায়, জাতীয়তাবাদী চিন্তা এদেশে মানুষের মস্তিষ্কে এমনভাবে জেঁকে বসেছে যে, মানুষ এ কাঠামোর আগেকার কোনো বাস্তবতা মনে করতে পারে না। এ কাঠামোকে ছাড়া কোনো ভবিষ্যতও কল্পনা করতে পারে না।

ইতিহাস আমাদের বলে—জাতীয়তাবাদ, সেক্যুলারিজম, গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র ইত্যাদি আদর্শ নয়, বরং একটি জাতি সাধারণত নিজের অধিকার ফিরে পেতে চায়। এই মূলনীতিটি সামনে রেখেই সাধারণত পরিবর্তনের ঝড়ের সূচনা ঘটে। ইতিহাসে দেখা যায়, জাতিরাষ্ট্রের ধারণা ব্যাপক হওয়ার পূর্বে বিভিন্ন গোত্র, বর্ণ বা ধর্মই ব্যাপকভাবে মানুষকে পরিবর্তনের সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ করেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক ইতিহাসে শেখ মুজিবসহ বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন আধুনিক সেক্যুলার নেতারা ধর্মের পরিবর্তে জাতীয়তাবাদকে মূল্যবোধ ও রাজনীতির ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে। ধর্মকে ঐক্য ও মূল্যবোধের মূল ভিত্তি না করে ব্যক্তিগত অভিরুচির অংশ করে দিয়েছে।

আধুনিক জাতীয়তাবাদীরা ধর্মকে পুরোপুরি মুছে ফেলেনি। কারণ এমনটা হলে প্রতিরোধের আগুন ঠেকানোর ক্ষমতা জাতীয়তাবাদী

স্লোগানের নাও থাকতে পারত। তারা কেবল ধর্মকে আদর্শের সিরিয়ালে নিচের দিকে নামিয়ে দিয়েছে।

আমরা সুনিশ্চিত যে, ইসলাম অবশ্যই জাতীয়তাবাদ অপেক্ষা শক্তিশালী আদর্শ! কিন্তু ইসলামের নের্তৃত্বকে জাতীয়তাবাদ দ্বারা প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হলো কিভাবে?

এর কারণ হলো, ইসলামি সচেতনতাবোধের সংকট। বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষণে ইসলামের শরণাপন্ন না হয়ে, পশ্চিমা জাতীয়তাবাদী চিন্তা ও কাঠামোর আশ্রয় নেয়া।

যদি ‘বাংলাদেশ’ নামক জাতিরাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানাকে অনিবার্য ও সাময়িক বাস্তবতা হিসেবে মেনে নেয়াও হয়, তবুও এই ভয়াবহ বাস্তবতা থেকে উত্তরণের জন্যে এবং আপামর জনসাধারণের তাওহীদ ও ঈমানের সুরক্ষায় “জাতীয়তাবাদ” নামক কুফরি চিন্তাধারা মুসলিম মানস থেকে উৎখাত করা ইসলামপন্থীদের অপরিহার্য দায়িত্ব।

এছাড়াও, এও বুঝে নেয়া দরকার যে, জাতীয়তাবাদীদের আনুগত্য বা এ মানসিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে ইসলামপন্থার উত্তরণ আদৌ সম্ভব নয়; কেননা, শত্রুর আদর্শ গ্রহণ করে কখনো বিজয়ী হওয়া যায় না।